চণ্ডীমঙ্গল

চণ্ডীমঙ্গল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম প্রধান কাব্য। এই ধারার অন্য দুই উল্লেখনীয় কাব্য মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল। জনশ্রুতি অনুসারে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি-কবি মানিক দত্ত। এই কাব্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি "কবিকঙ্কণ" মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। অন্যান্য কবিদের মধ্যে দ্বিজ মাধব বিশেষ উল্লেখনীয়।

চণ্ডীমঙ্গল দেবী চণ্ডীর মহিমা গীত। কিন্ত প্রাচীন চণ্ডীমঙ্গলের কবিদের বর্ণনায় অভয়া নামে উল্লিখিত এই দেবী আদিতে পুরাণে বর্ণিত দেবী মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী ছিলেন না। অবশ্য চণ্ডীমঙ্গল রচনার কয়েক শতাব্দী পূর্বেই তিনি পৌরাণিক চণ্ডীর সঙ্গে মিলে গিয়েছেন। অভয়া মুখ্যত বনদেবী যা ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের অরণ্যানী স্তবের সাথে সম্পৃক্ত। চন্ডীমঙ্গলের কালকেতু-আখ্যানে তিনি দ্বিভূজা, তার প্রতীক মঙ্গলঘট, পূজার উপচার মাঙ্গল্য ধানদূর্বা।তিনি পশুমাতারূপে পূজিতা।

আখ্যানবস্তু

চণ্ডীমঙ্গলের আখ্যানভাগ মূলতঃ পারস্পরিক যোগসূত্রহীন দুটি পৃথক কাহিনীর সমন্বয়। প্রথম কাহিনী, আখেটিকখণ্ড প্রাচীনতর। দ্বিতীয় কাহিনী, বণিকখণ্ড তুলনামূলকভাবে নবীন। এই দুটি কাহিনীই আনুমানিক ১১০০ সালে, লোককথা বা দেবীমাহাত্ম্যকথা যে কোন রূপেই হোক, অজানা ছিল না বলে জানা গেছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণের একটি শ্লোকেও এই দুটি কাহিনীরই ইঙ্গিত রয়েছে।

আখেটিক খণ্ড

আখেটিকখণ্ড বা আক্ষটিখণ্ড ব্যাধ কালকেতু ও তার পত্নী ফুল্লরার প্রতি দেবীর অনুগ্রহের কাহিনী। দেবীর অনুরোধে শিব তার ভক্ত নীলাম্বরকে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যলোকে পাঠান। নীলাম্বর কালকেতু হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কালকেতুর যৌবনপ্রাপ্তির পর তার পিতা ধর্মকেতু ফুল্লরার সঙ্গে তার বিবাহ দেন। কালকেতুর পরিবার অতি দরিদ্র কিন্ত সুখী সংসার। এদিকে কালকেতুর শিকারে প্রায় নির্মূলিত কলিঙ্গের বনের পশুদের আবেদনে কাতর হয়ে দেবী স্বর্ণগোধিকা রূপে কালকেতুর শিকারে যাবার পথে প্রকট হলেন। কালকেতুর শিকারে যাবার সময় অমঙ্গলজনক গোধিকা দেখার পর কোন শিকার না পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে গোধিকাটিকে ধনুকের ছিলায় বেঁধে ঘরে নিয়ে আসেন। কালকেতু গোধিকাকে ঘরে বেঁধে পত্নীর উদ্দেশে হাটে রওনা হন। হাটে ফুল্লরার সঙ্গে দেখা হলে তাকে গোধিকার ছাল ছাড়িয়ে শিক পোড়া করতে নির্দেশ দেন।

আছয়ে তোমার সই বিমলার মাতা

লইয়া সাজারু ভেট যাহ তুমি তথা।

খুদ কিছু ধার লহ সখীর ভবনে

কাঁচড়া খুদের জাউ রান্ধিও যতনে।

রান্ধিও নালিতা শাক হাঁড়ি দুই তিন

লবণের তরে চারি কড়া কর ঋণ।

সখীর উপরে দেহ তন্ডুলের ভার

তোমার বদলে আমি করিব পসার।

গোধিকা রাখ্যাছি বান্ধি দিয়া জাল-দড়া

ছাল উতারিয়া প্রিয়ে কর শিক-পোড়া।

ফুল্লরা ঘরে ফিরলে, দেবী এক সুন্দরী যুবতীর রূপে ফুল্লরাকে দেখা দিলেন। ফুল্লরার প্রশ্নের উত্তরে দেবী জানালেন ফুল্লরার স্বামীই তাকে এখানে এনেছেন এবং তিনি এই গৃহেই কিছুদিন বসবাস করতে চান।

ইলাবৃত দেশে ঘর জাতিতে ব্রাহ্মণী

শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকিনী।

বন্দ্যবংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল

সতা সাথে গৃহে বাস বিষম জঞ্জাল।

তুমি গো ফুল্লরা যদি দেহ অনুমতি

এই স্থানে কথ দিন করিব বসতি।

হেন বাক্য হৈল যদি অভয়ার তুন্ডে

পর্বত ভাঙিয়া পড়ে ফুল্লরার মুন্ডে

হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা

ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল রন্ধনের ত্বরা।

দেবীকে তাড়াতে ফুল্লরা নিজের বারমাসের দুঃখকাহিনী বিবৃত করলেন, তবু দেবী অটল। শেষ পর্যন্ত ফুল্লরা ছুটলেন হাটে, স্বামীর সন্ধানে। উভয়ে গৃহে ফেরার পর দেবীর অনুগ্রহে কালকেতু ধনী হয়ে পশু শিকার ত্যাগ করলেন। বনের পশুরাও নিশ্চিন্ত হল। দেবীর আশীর্বাদে ধনলাভ করে কালকেতু বন কেটে গুজরাট নগর পত্তন করলেন। গুজরাট নগরে নবাগতদের মধ্যে ছিল এক প্রতারক, ভাঁড়ু দত্ত। প্রথমে কালকেতু তাকে বিশ্বাস করলেও, প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করায় তাকে তাড়িয়ে দেন। ভাঁড়ু দত্ত কলিঙ্গের রাজার কাছে গিয়ে তাকে কালকেতুর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। কলিঙ্গের সেনাপতি গুজরাট আক্রমণ করে কালকেতুকে বন্দী করেন। কিন্তু দেবীর কৃপায় কালকেতু শীঘ্রই মুক্ত হন। কাল পূর্ণ হলে কালকেতু ও ফুল্লরা স্বর্গে ফিরে যান।

বণিকখণ্ড

বণিকখণ্ডের সূচনায় শিবভক্ত বণিক ধনপতি দেবী পূজায় অস্বীকার করেন। ইন্দ্রের সভার নর্তকী রত্নমালা শাপগ্রস্ত হয়ে ধনপতির প্রথম পত্নী লহনার খুড়তুত বোন খুল্লনারূপে জন্ম নেন। ধনপতি খুল্লনার সঙ্গে তার দ্বিতীয় বিবাহের অচিরেই বিদেশযাত্রায় রওনা হলে, প্রথম পত্নী লহনা তার দাসী দুবলার কুপরামর্শে খুল্লনাকে প্রতিদিন ছাগল চড়াতে যেতে বাধ্য করেন। খুল্লনার অষ্টমঙ্গলার পূজায় দেবী সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সমস্ত বিপত্তি থেকে রক্ষা করেন। ধনপতি পুনরায় সিংহলের উদ্দেশে বাণিজ্যযাত্রায় রওনা হন। দেবী ধনপতিকে লাঞ্ছনার মনসায় সিংহলের অনতিদূরে কালিদহে তাকে হস্তীনিধনরত কমলেকামিনী রূপদর্শন করান। কিন্তু দেবীর মায়ায় অন্য কোন নাবিক এই দৃশ্য দেখতে পায় না। সিংহলের রাজার কাছে ধনপতি কমলেকামিনীর বর্ণনা করলে, রাজা বিশ্বাস করেন না। ধনপতি রাজাকে কমলেকামিনী দর্শন করাতে ব্যর্থ হয়ে কারারুদ্ধ হন। পিতার সন্ধানে পুত্র শ্রীপতি সিংহলের উদ্দেশে যাত্রা করেন। দেবীর মায়ায় তিনিও কমলেকামিনী রূপদর্শন করেন এবং সিংহলের রাজার কাছে বর্ণনা করে একই রকম বিপদে পড়েন। রাজা তাকে প্রাণদন্ড দেন। কিন্তু মশানে দেবীর সৈন্যের কাছে পরাস্ত হয়ে রাজা শ্রীপতিকে মুক্তি দিয়ে কন্যা সুশীলার সঙ্গে তার বিবাহ দেন। পুত্র শ্রীপতির প্রয়াসে

সিংহলের কারাগার থেকে উদ্ধার পেয়ে ধনপতিও দেবীর মহিমা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মধ্যযুগের বাঙালি কবি। ধারনা করা হয় তার জন্ম ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে। তার বিখ্যাত কাব্য চণ্ডীমঙ্গলকাব্য প্রাচীন পাঁচালী রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এর রচনাকাল ১৫৪৪ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময় বলে বিবেচনা করা হয়।

জন্ম ও বংশবৃত্তান্ত

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর (আনুমানিক ১৫৪০-১৬০০) পিতা হৃদয় মিশ্র এবং মাতা দৈবকী। তার পৈতৃক নিবাস বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে। ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যচারে উৎখাত হয়ে আনুমানিক ১৫৫৭ খ্রিষ্ট্রাব্দে মুকুন্দরাম পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করে মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামে আশ্রয় নেন,সে খানে গ্রাম্য জমিদার বাঁকুড়া রায়ের দ্বারস্থ হন। তিনি রাজা রঘুনাথের সমসাময়িক ছিলেন। মুকুন্দরাম তার চন্ডীমঙ্গল কাব্যের নামকরণ করেন অভয়ামঙ্গল ও অম্বিকামঙ্গল । গণজীবনের করুণ চিত্র তার কাব্যে তুলে ধরেন। কবির প্রতিভার স্বকৃতিস্বরূপ রাজা রঘুনাথ তাকে কবি কঙ্কন উপাধি প্রদান করেন। তার পূর্ণ নাম হচ্ছে কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তবে এই রচনাকে কেউ কেউ ' কবিকঙ্কণ চন্ডী'ও বলেছেন। 'কবিকঙ্কণ' কথার মানে যে কবি হাতে অথবা পায়ে ঘুঙুর পরে গান করতেন। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের পেশাদার গায়ক।

মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের সমালোচনা

কবির আত্মজীবনী থেকে জানতে পারি মোটামুটি ভাবে ১৫৯৪-১৬০৩ খ্রিঃ-এর মধ্যে তার কাব্য রচিত হয়। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের অধিকাংশ ভনিতায় অভয়ামঙ্গল নামে কাব্যটির উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রন্থের ছত্রসংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। মুকুন্দের গ্রন্থের এই গ্রন্থের তিনটি খণ্ডঃ দেবখণ্ড, আখেটিকখণ্ড ও বণিকখণ্ড। গ্রন্থটিতে মুকুন্দের "কবিত্বের বিবরণ" অর্থাত আত্মকথা অংশটির দুটি পৃথক রূপ বিভিন্ন পুঁথিতে পাওয়া যায়।

তিনি তার কাব্যে উপন্যাসের বীজ বপন করেছেন। আধুনিক যুগের সাহিত্য সমালোচকগণ তার সম্পর্কে বলেছেন - ' মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মধ্যযুগে জন্মগ্রহণ না করে আধুনিক যুগে জন্মগ্রহণ করলে কাব্য না লিখে উপন্যাস লিখতেন '। যদি এমন কোন গ্রন্থের নাম করতে হয় যাতে আধুনিক কালের, উপন্যাসের,রস কিছু পরিমাণে মেলে যেমন- নিপুণ পর্যবক্ষেণ, সহৃদয়তা, জীবনে আস্থা, ব্যাপক অভিজ্ঞতা সবই এতে যথোচিত পরিমাণে বর্তমান। মুকুন্দরাম শুদ্ধাচারী বামুন-পন্ডিতঘরের ছেলে, আজন্ম দেববিগ্রহ সেবক। কিন্তু তার সহানুভূতি থেকে কেউই বঞ্চিত হয়নি - না বনের তুচ্ছতম পশু না জনপদের দুর্গততম মানুষ।সংস্কৃত অলঙ্কার প্রয়োগের পাশাপাশি লোক-ব্যবহার, ছেলেভোলানো, ছেলেখেলা, মেয়েলি ক্রিয়াকান্ড, ঘরকন্নার ব্যবস্থা, রান্নাবাড়া ইত্যাদি অনপেক্ষিত সামাজিক ও সাংসারিক ব্যাপারেও বিস্ময়কর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

মুকুন্দরামের কাব্য মানবজীবনরসে পূর্ণ। স্বভাবগত কবিত্ব শক্তির প্রসাদে তাঁর কাব্যে উপন্যাসের বর্ণনা-নৈপুণ্য, নাটকের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং বিচিত্র জীবনরসের প্রকাশ ঘটেছে। বস্তুতান্ত্রিক ঔপন্যাসিকদের অগ্রদূত মুকুন্দরামের মুরারি শীল, ভাঁড়ুদত্ত ও ফুল্লরা চরিত্র বাংলা সাহিত্যের অমর সৃষ্টি। এসব কারণে তাঁর চন্ডীমঙ্গল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি।

তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া